আলী তানতাভী

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-১

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
অনূদিত

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-১

আলী তানতাভী

আঁধার রাতের বন্ধু
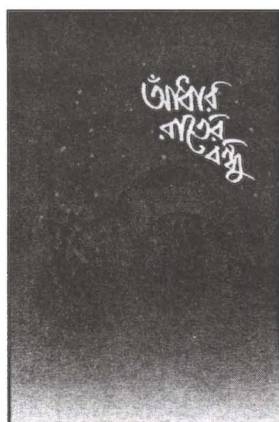
অনুবাদ
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-১

লেখক : আলী তানতাভী
অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮ ঈ.

কিতাব কানন, দোকান নং- ৪০ (দোতালা), ১১ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস স্বামীবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
বশির মেসবাহ

মূল্য:
৪০.০০ টাকা মাত্র

Shishu Koshur Series: Golpe Anaka Etihash- { History in drawn Story} by Ali Tantawi, Translated by Yahya Yusuf Nadwi, Published by : Kitab Kanan, Islami Towar, 11 Bangla Bazar, Dhaka. Price : $ 3 only £ : 2 only

লেখকের ভূমিকা

গল্প পছন্দ করে না, ভালোবাসে না– এমন শিশু-কিশোর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শুধু শিশু-কিশোর কেনো? কমবেশি সবাই ভালোবাসে গল্প।
বলতে পারো, অতীতের কোন্ স্মৃতিটা মানুষকে সবচে' বেশি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ডেকেই চলে অবিরত? জানি না, উত্তরে তুমি কী বলবে। তবে আমার মতে– সে হলো দাদী'র গল্পের আসর! আহা! কী মধুময় সেই স্মৃতি!! শৈশবকালে দাদী'র কাছে গল্প শোনার সেই গাল-ফোলানো ও কপাল-কুঁচকানো বায়নার কথা– কে ভুলতে পারে?
-'এই দাদু! একটা গল্প বলো না!'
-'দুর! এখন কি গল্পের সময়?'
-কখন তাহলে? এতো 'এখন না তখন' করো না তো! এক্ষুণি বলো, বলতেই হবে! নইলে আমি তোমার আঁচল ধরে ঝুলে থাকবো, ছাড়বো না! ছাড়বোই না!'
-'অমন করো না সোনামণি! দাদুর যে এখন অনেক কাজ! অন্য সময় বলবো। এখন যাও, পড়তে বসো।'
-'না, এক্ষুণি বলতে হবে! না হলে আমি পড়তেও যাবো না, তোমাকে কোনো কাজও করতে দেবো না!'

অবশেষে দাদী-নাতি'র যুদ্ধে হার মানেন দাদী। হাসিমাখা হার। নাতিটিকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে এঁকে দেন– একটা মিষ্টি চুমু। তারপর বলতে শুরু করেন–
'এক দেশে ছিলো এক রাজা ...!'
'সে অনেক অনে-ক দিন আগের কথা..।'
নাতির আনন্দ তখন দেখে কে! গল্প শুনতে শুনতে সে হারিয়ে যায় এক অজানা জগতে। আনন্দে, উত্তেজনায় চোখ বড় করে, কান খাড়া করে গিলতে

থাকে সে গল্পের কাহিনী। কিন্তু কতোক্ষণ আর! এক সময় তন্দ্রায় দুলতে থাকে নাতি। তবু ওঠার নাম নেই। গল্পের শেষ না শুনে কিসের আবার ঘুম?

আহ! কী মজার সেই স্মৃতি!! তাই না?

* * *

শিশু হয় কিশোর, তারপর পরিণত যুবক। তবু সে ভুলতে পারে না চাঁদনি রাতের মায়াবী জোৎস্নায় দাদী'র গল্পের আসরের সেই স্মৃতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গল্পের প্রতি তার এই ঝোঁক ও আকর্ষণ। তার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে– সেই হারানো শৈশবে, মাদুরপাতা উঠানে, দাদী'র কাছে, চাঁদনি রাতের সেই গল্পের আসরে!

পাঠক! আমার বড়ো কষ্ট লাগে যখন গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের এই ঝোঁক ও আকর্ষণকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের ব্যর্থতায় দুশমনরা আমাদের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়– গল্প নামের বিষ! আমাদের এই গাফিলতির জন্যে আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?

হ্যাঁ পাঠক! এই দায়বোধ থেকেই আমি প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্যে লিখেছি এই গল্প সিরিজ– ইতিহাসের সত্য কাহিনী অবলম্বনে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমি ইতিহাসের রসকসহীন কোনো পাঠ খুলে বসেছি তোমার সামনে। আমি বরং ইতিহাসকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রেখে শুধু গল্পের জামাটা পরিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের গায়ে।

আশা করি ওরা বেশ মজা করে এই গল্পগুলো পড়বে এবং আমাদের সোনালী যুগের সোনালী ইতিহাস থেকে আত্মপরিচয় খুঁজে নেবে।

হে আল্লাহ! সাহায্য চাই শুধু তোমার কাছে।

বিনিময়ও চাই শুধু তোমারই কাছে।

-আলী তানতাভী

অনুবাদকের কথা

এক.

‘গল্পে আঁকা ইতিহাস’ শায়খ আলী তানতাভীর লেখা একমাত্র শিশুতোষ গল্প সিরিজ। তাঁর অন্যান্য প্রসিদ্ধ অনেক কিতাব আমার পড়ার সৌভাগ্য হলেও তাঁর এ-সিরিজটি আমি হাতে পেয়েছি কয়েক বছর আগে।

সত্যি কথা বলতে কি, হাতে পাওয়া মাত্রই আমি তা এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতোই পড়ে ফেলি। তারপরই বসে যাই অনুবাদে। ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। কারণ, সিরিজটি যার-তার নয়– আলী তানতাভীর! কে তিনি? অনেক বড় মানুষ! আরব বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক। শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী। তাছাড়া এটি একটি গল্প-সিরিজ। ইতিহাসের গল্প। কেমন সেই ইতিহাস? আমাদের সোনালী যুগের ইতিহাস। যে ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে আমাদের শিশু-কিশোরদের জীবন গড়ার হাজারো উপকরণ ও পাথেয়।

বইটি পড়া শেষ করে আমি জানার চেষ্টা করেছিলাম– আলী তানতাভী শিশুতোষ আর কী কী লিখেছেন। জানতে পারলাম– আর কিছু লিখে যেতে পারেন নি। আমার আফসোস হলো– হায়! তিনি যদি আমাদের ‘অসহায়’ শিশু-কিশোরদের জন্যে আরো অনেক অনে-ক লিখে যেতেন!

সিরিজটি কাদের জন্যে এবং কেনো লেখা হয়েছে, তা লেখক নিজেই তাঁর শক্তিশালী ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আমি সেদিকে না গিয়ে শুধু বলবো– আমাদের হাতের নাগালে শিশুতোষ বইয়ের নামে বামপল্লীতে এবং এখানে সেখানে আমরা যে সব বইয়ের ছড়াছড়ি ও ‘কাটতি’ দেখি, তা আসলে শিশু-কিশোরদের সুস্থ ইসলামী মানস গঠনে এবং ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসকে তাদের সামনে মেলে ধরতে ইতিবাচক ভূমিকা তো পালন করছেই উল্টো শিশু-কিশোর মানসকে গল্প ও শিশু-সাহিত্যের নামে তাদেরকে দ্বীন থেকে, দ্বীনের ভালোবাসা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে আমাদের শিশু-কিশোররা আমাদের দুশমনের খেলার পুতুলে পরিণত হচ্ছে– নিজেদের অনিচ্ছায়, অভিভাবকদের অজান্তে, অবহেলায়।

অবশ্য এর জন্যে শুধু ‘ওরা’ই দায়ী নয়, আমরাও দায়ী। আমরা শিশুদের

নিয়ে ভাবছি না। কিংবা যেভাবে ভাবা দরকার সেভাবে ভাবছি না। কিংবা শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে সুন্দর মার্জিত ও গঠনমুখী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির সুপ্রয়াস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি না। মান ও গুণের দৈন্যতাও আছেই, যা আমাদের পিছিয়ে থাকার একটি বড় কারণ। তবে হতাশার কিছু নেই। আমাদের এ-সঙ্কটকাল আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। উন্মুচিত হচ্ছে আমাদের সামনে নতুন নতুন দিগন্ত।

দুই.

আমাদের শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার যে মহান ধারা শুরু হয়েছে, আমার বিশ্বাস– 'গল্পে আঁকা ইতিহাস' সিরিজটি সে ধারায় কিছুটা হলেও গতি সৃষ্টি করবে।

বইটি এখন বের হচ্ছে 'কিতাব কানন' থেকে। 'কিতাব কানন' একটি নতুন প্রকাশনী। কিছু প্রতিশ্রুতি এবং কিছু লক্ষ্য নিয়ে এর সফর শুরু হয়েছে। আল্লাহ কবুল করুন!

শেষ করার আগে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তায আল্লামা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম এই বইটি অনুবাদ করার পর আমাকে ডেকে দু'আ দিয়েছেন। সিরিজের প্রথম কয়েকটি বই নিপুণভাবে সম্পাদনা করে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে লিখতে হয়, লেখা শিখতে হয় এবং নিজের লেখাকে আসামী'র কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজেকেই নিজের ভুল বের করতে হয়।

আল্লাহ তাঁর নেক হায়াত আরো বাড়িয়ে দিন। তাঁর মুবারক হাতে তৈরী হোক শিশু সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

বিনীত

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
বাড়ি- ১/৭, সড়ক- ২০ এন এস রোড,
ব্লক- এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
০১৮১৫৪৬১২২৭

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-১

আঁধার রাতের বন্ধু

আঁধার রাতের বন্ধু

এক দানবীরের কথা

বারশ বছর আগের কথা। তখন সুলায়মান বিন আবদুল মালিক মুসলিম জাহানের খলীফা। বাগদাদ তাঁর রাজধানী। সে সময়ের এক কাহিনী নিয়েই আমি হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে।

'রাকা' শহরে বাস করতেন এক লোক। নাম তার খোযায়মা বিন বিশ্‌র। তার ছিলো অনেক ধন-দৌলত, কিন্তু ছিলো না কৃপণতা ও অহঙ্কার। ধন-সম্পদের ছোঁয়া লাগলে অনেক মানুষ কৃপণ হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার নির্দয়ও হয়ে যায়। খোযায়মা বিন বিশ্‌র এমন ছিলেন না। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন প্রাণভরে আর দান করতেন হাত খুলে। দানের আশায়, দয়ার আশায়– তার দুয়ারে ছুটে আসতো মানুষ দলে দলে। কেউ খালি হাতে ফিরে যেতো না। কখনো কারো আশা অপূর্ণ থাকতো না। কেউ বঞ্চিত হতো না তার দান ও ধন থেকে। তার ভালোবাসা ও অনুগ্রহ থেকে।

তার দান ছিলো সবার জন্যে এবং সব সময়ের জন্যে। তার দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো দিবা-রাত্র এবং সর্বত্র। এভাবে মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে এবং মানুষকে দান করে, ধন্য করে বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটছিলো তার সময়।

দানে তো ধন কমে না, বরং বাড়ে। বরকত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একদিন খোযায়মা'র ধন কমে গেলো। কমতে কমতে

একেবারে সে গরীব হয়ে গেলো। এমনকি ক্ষুধা-অনাহার তার নিত্য সঙ্গী হয়ে গেলো।

আমীর যখন ফকীর

এখন কী করা? সারা জীবন দু' হাতে যিনি দান করেছেন মানুষকে, তিনি কি পারেন কারো কাছে হাত বাড়াতে? তবু তার ভাই-বেরাদার যখন তাকে সাহায্য করতে চাইলো, তিনি 'না' বলতে পারলেন না। বরং স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে হাত পেতে নিলেন তাদের দান।
কিন্তু রক্তের টান কতোদিন আর?

এক সময় রক্তের আত্মীয়রাও পিছিয়ে গেলো। আত্মার আত্মীয়রাও দূরে সরে গেলো। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো সবার দয়ার দুয়ার। খোযায়মা'র আলো ঝলমল সংসারে নেমে এলো তিমির অন্ধকার। আমীরের সংসার হয়ে গেলো একেবারে ছারখার।

জীবন-সঙ্গিনী আমি!
সুখে ছিলাম পাশে, দুঃখেও আছি সাথে!

তবু খোযায়মা হতাশ হলেন না। হতাশ কেনোই বা হবেন? মানুষের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে বলে কি আল্লাহ্র দুয়ারও বন্ধ হয়ে যাবে? না, তা হতেই পারে না! আল্লাহ্র দুয়ার সব সময় খোলা থাকে, কক্খনো বন্ধ হয় না!
তাহলে খোযায়মা কেনো হতাশ হবেন?
আল্লাহ্র সাহায্য থেকে কেনো তিনি বঞ্চিত হবেন?
কিন্তু খোযায়মা জীবন-সঙ্গিনীকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। একদিন তাকে তিনি বুঝিয়ে বললেন–

'আমি চাই না– আমার সাথে থেকে থেকে তুমিও কষ্ট পাও। তারচে' তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও। আজ থেকে আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্য নেবো না। ঘরেই বসে থাকবো দরোজা বন্ধ করে । হয় আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য নয় আসবে মৃত্যু!'
স্ত্রী বললেন–

'এ কেমন কথা? সুখের সাগর এক সাথে পাড়ি দিয়ে আজ দুঃখের সাগরে আপনাকে একলা ভাসিয়ে চলে যাবো আমি! তেমন মেয়েই ভেবেছেন আমায়? কক্‌খনো না! সুখে-দুঃখে ও জীবনে-মরণে আমরা এক সাথেই থাকবো। আমার ঘর আপনার সাথে। আমার কবরও হয় যেনো আপনার পাশে!'
তাই হলো।
ঘরকে কবর বানিয়ে তারা পড়ে থাকলেন।
হায়! অমন ভালো মানুষের এমন কষ্ট!
কার না চোখে পানি আসে– বলো?
সারা জীবন যিনি মানুষের উপকার করলেন,
সেই উপকারী বন্ধুর দুর্দিনে আজ কেউ পাশে এসে দাঁড়ালো না! একটু খবরও নিলো না!
তাই মানুষের প্রতি এবং মানুষের এই সমাজের প্রতি তার যদি অভিমান হয়, তাহলে কি অন্যায় হবে?

ইকরামা ফাইয়ায

রবীআ গোত্রের ইকরামা ছিলেন তখন আরব-উপদ্বীপের শাসনকর্তা। বড়ো ভালো মানুষ তিনি। মনে যেমন প্রশস্ত, দানে তেমন মুক্তহস্ত। তাই লোকে বলে– 'ইকরামা ফাইয়ায'– দানবীর ইকরামা!

তিনি একদিন তার পরিষদকে জিজ্ঞাসা করলেন–
'খোযায়মাকে আজকাল দেখছি না যে! তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?'
একজন বললো–
'আমাদেরও তো একই জিজ্ঞাসা। হয়তো দূরের কোনো সফরে গেছেন।'
একটু নীরবতার পর আরেকজন বললো–
'আমি যদ্দূর জানি– শহরেই আছেন তিনি। তবে মানুষের প্রতি অভিমান করে প্রতীজ্ঞা করেছেন, ঘরের দরোজা খুলে আর কখনো তিনি মানুষের সমাজে বের হবেন না!'
'কেনো কেনো?!' শাসনকর্তা যেমন অবাক হলেন তেমনি উদ্বিগ্ন হলেন।
লোকটি তখন শাসনকর্তাকে সব খুলে বললো। সব শুনে শাসনকর্তা বললেন–
'তার সাহায্যে কেউ-ই এগিয়ে আসে নি? শহরে কি ধনী মানুষ নেই?!'
'হুজুর! আল্লাহ্‌র কী লীলা! ধন আছে তো মন নেই, আবার মন আছে তো ধন নেই! আল্লাহ না করুন, আপনার জীবনে কখনো যদি দুঃসময় আসে, তাহলে দেখবেন– মানুষ 'দিরহাম-দিনার' নিয়ে আপনার সাহায্যে ছুটে আসবে, কিন্তু কখন? যখন তারা বুঝবে– আবার আপনার ধন-জন হবে এবং তারা তাদের উপকারের বদলা পাবে। কিন্তু যদি টের পায় যে, আপনার ভাগ্যের সিতারা ডুবে যাচ্ছে এবং মাঝ দরিয়ায় আপনার যিন্দেগীর কিশতি কাত হয়ে গেছে তাহলে সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবে। স্বার্থ ও মুনাফা-চিন্তাই হলো এখন মানুষের বন্ধুত্বের বুনিয়াদ। শুধু আল্লাহকে

ভালোবেসে নিঃস্বার্থভাবে কেউ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে না!'

'তুমি ঠিক বলেছো।' এই বলে শাসনকর্তা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তাতে পরিষদের সবাই বেশ অবাক হলো। আর যারা ভেবেছিলো– এবার হয়তো খোযায়মা'র দুঃখের অবসান হবে, তারা বেশ হতাশ হলো।
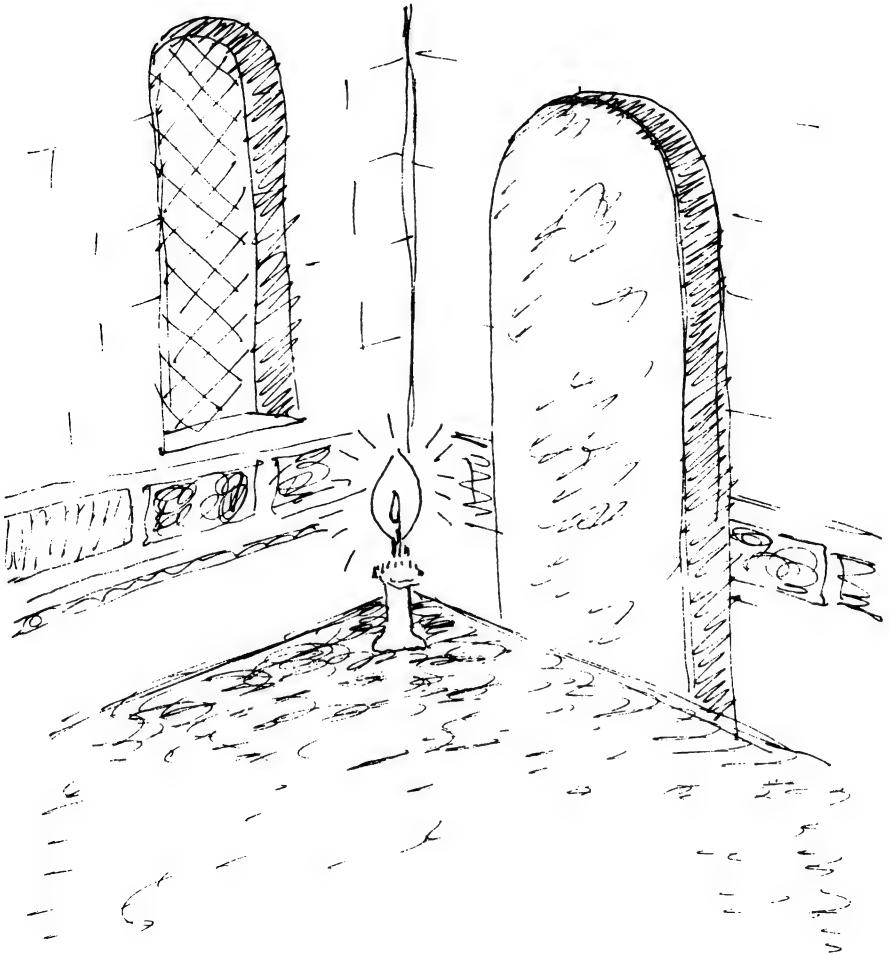
অনাহারে তিনদিন

এ দিকে 'ওরা দু'জন' একে একে তিন দিনের অনাহারে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। কিন্তু স্ত্রীর করুণ অবস্থায় খোযায়মা অস্থির হয়ে ভাবলেন– আমার মৃত্যু হয় হোক, কিন্তু অনাহারে প্রিয়তমা স্ত্রীর তিলে তিলে মৃত্যু, সে আমি সইবো কেমন করে? তার প্রাণ রক্ষার জন্যে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে।'

খোযায়মা দরোজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। ক্ষণিকের তরে ভুলে গেলেন আগের সেই কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা। কিন্তু কোথায় যাবেন খোযায়মা? কার কাছে হাত পাতবেন? খোযায়মা ভাবলেন– তার 'দান' ও 'দানা' খেয়ে কিংবা ঋণের টাকা হজম করে আজ যারা 'বড়' হয়েছে, তাদের কাছেই গিয়ে দাঁড়াবেন তিনি সাহায্যের হাত দরাজ করে। দু'পায়ে অনাহার ক্লিষ্ট দেহের ভার বহন করে তিনি কিছুদূর গেলেনও, কিন্তু আত্মমর্যাদার ভার বহন করা আর সম্ভব হলো না!

এতোদিনের দাতা আজ হবেন গ্রহীতা?!

তাও একদল অকৃতজ্ঞ মানুষের দুয়ারে?!

অসম্ভব!

ধনে গরীব হলেও মনে তো তিনি গরীব হন নি!

হৃদয়ের প্রাচুর্যই তো বড় প্রাচুর্য!

তাহলে কেনো তিনি ধনের জন্যে মনকে কলুষিত করতে যাবেন– এই অকৃতজ্ঞদের কাছে?

খোযায়মা আবার ফিরে এলেন তার 'ঘরের কবরে'।

আঁধার রাতের বন্ধু

গভীর রাতে খোযায়মা'র দরোজায় কে যেনো আওয়াজ দিলো। বেসামাল ক্ষুধায় কাতর তার দেহটা। নড়াচড়ার শক্তি নেই। তবু অনেক কষ্টে উঠে এসে দরোজায় দাঁড়ালেন খোযায়মা। দেখলেন– মুখোশধারী এক ঘোড়সওয়ার। খোযায়মাকেও সে দেখলো। কিন্তু ঘোড়া থেকে নামলো না। কোনো কথাও বললো না। গভীর রাতের নির্জন প্রহরে নিজের বাড়ির দরোজায় মুখোশধারীকে দেখে খোযায়মা বেশ বিস্মিত হলো। তার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই ঘোড়সওয়ার একটা ভারী থলে তার দিকে এগিয়ে দিলো। খোযায়মা সে দিকে হাত না বাড়িয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন–

'কে আপনি? কী আপনার পরিচয়?'

'আল্লাহ আমাকে আপনার দুয়ারে এনেছেন। আমার পরিচয় জানার দরকার নেই। এটা একজন ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষ থেকে এক 'মানব-দরদী'র জন্যে সামান্য হাদিয়া। দান বা দয়া নয়! আল্লাহ ছাড়া কেউ এর সাক্ষী নেই!'

'আল্লাহ্র কসম! আপনার পরিচয় না জেনে আমি এটা গ্রহণ করবো না!'

'আমি মানুষের অকৃতজ্ঞতার মাশুল আদায় করি– এ-ই আমার পরিচয়!'

'আরেকটু খুলে বলুন!'

'মাফ করুন!'

এই বলে থলেটি খোযায়মা'র সামনে রেখে ঘোড়সওয়ার চোখের পলকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এবং মুহূর্তেই অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

দুঃখের পাশেই থাকে সুখ
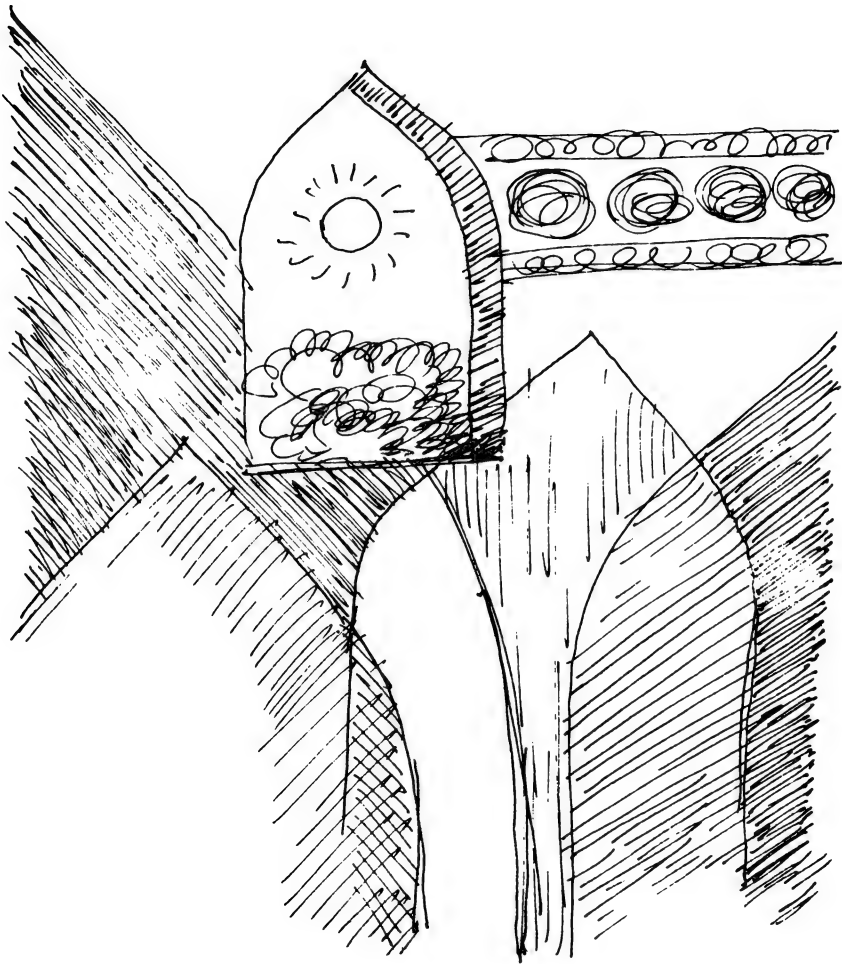
হ্যাঁ, দুঃখ-রজনী যতো দীর্ঘই হোক, আড়ালেই তার লুকিয়ে থাকে আলোকিত ঊষা! সেই দুঃখ-রজনীর গায়ে যখন আলোকিত ঊষা

তাপ ছড়ায়, তখন অন্ধকার গলে গলে নেই হয়ে যায়!
বিস্ময়-বিহ্বল খোযায়মা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। থলেটা উঠিয়ে নিতে নিতে মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। বললেন– 'শোকর তোমার হে মাওলা!'
ভিতরে এসে খোযায়মা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন–
'দেখো, দেখো! আল্লাহ কতো তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন! বাতি জ্বালো! অন্ধকার দূর করো!'
শত বেদনার ভিতরেও স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললো–
'বাতি জ্বালাবো! কিন্তু তেল যে নেই!'
খোযায়মা লজ্জিত হয়ে বললেন–
'ও তাইতো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'
কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারেও যখন সোনার আশরাফিগুলো ঝলমল করে উঠলো, দু'জনের মুখ থেকেই এক সাথে উচ্চারিত হলো– 'আল-হামদুলিল্লাহ!' শোকর তোমার হে আল্লাহ!'

* * *

বন্ধু!
কে এই আঁধার রাতের ঘোড়সওয়ার?
অকৃতজ্ঞ মানুষের মাশুল আদায়কারী?
মাটির মানুষ না আসমানের ফেরেশতা?
আকৃতিতে মাটিরই মানুষ! কিন্তু যদি বলি– মহত্ত্বে ফেরেশতা থেকেও অনেক উঁচুতে তাঁর অবস্থান– তাহলে তুমি কি পারবে 'না' বলতে? কিন্তু তাঁর পরিচয়? দাঁড়াও, বলছি।

দরদী বন্ধু! কে তুমি?

তিনি আর কেউ নন, আরব উপ-দ্বীপের শাসনকর্তা স্বয়ং ইকরামা ফাইয়ায! সেদিন খোযায়মা'র 'ঘটনা' জেনে চার হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলে নিয়ে নিজেই তিনি হাজির হয়েছিলেন খোযায়মা'র
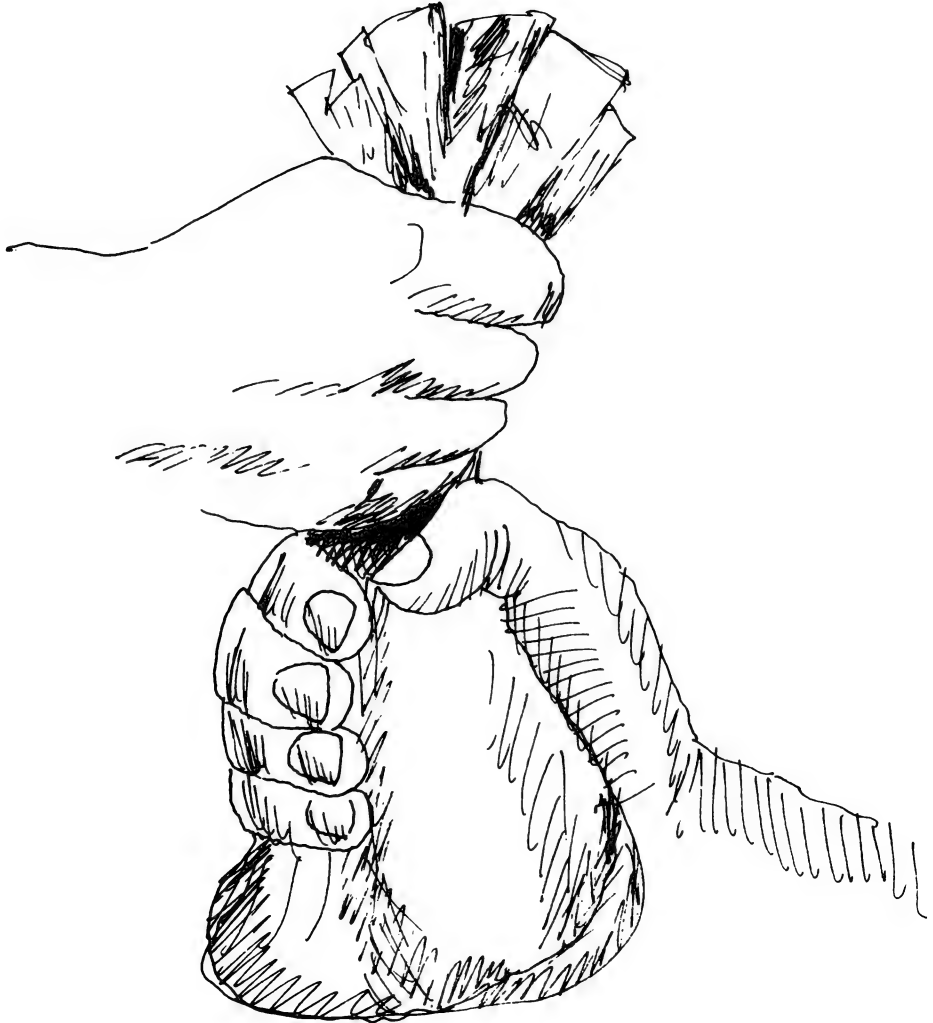
ভাঙা দুয়ারে! ফিরে এসেছিলেন বিবেকের অপরিসীম প্রশান্তি নিয়ে! খোযায়মা'র বিস্ময়মাখা পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও পরিচয়টা গোপন রেখে যখন তিনি বাতাসের গতিতে ঘোড়াটা ছুটিয়ে দিলেন, তখন দান-সুখের উল্লাসে তাঁর চোখ হাসছিলো, মুখ হাসছিলো!

কেননা মহত্ত্বের এই মহা দুর্ভিক্ষের যুগে,
অকৃতজ্ঞ মানুষের এই ভিড়ের মাঝে,
নিমকহারামদের এই নীরবতার ভিতরে–

তিনি মানবতার লাজ রক্ষা করতে পেরেছেন, তাই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার জোয়ারে বান ডেকে গেলো তাঁর হৃদয়-মনে।

তিনি দান করেছেন চার হাজার দিনার। কিন্তু মনের পরতে পরতে অনুভব করছেন চল্লিশ হাজার দিনার প্রাপ্তির আনন্দ। চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের আনন্দ চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির আনন্দকেও ম্লান করে দিতে পারে! হোক না চার এবং চল্লিশের মাঝে বিশাল ব্যবধান!!

স্বাদ ও তৃপ্তির আসল ঠিকানা

এই পৃথিবীতে কতো কী রয়েছে– স্বাদের ও তৃপ্তির। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম স্বাদ ও তৃপ্তি কিসে, জানো কি? বলবে কি? মানুষের দুঃখ মোচনে! মানুষের উপকার সাধনে!! পরোপকারের ভিতরে!! পরোপকারের তৃপ্তি সত্যি অতুলনীয়। মনে করো, পরোপকারীর আর কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু এই যে আত্মিক তৃপ্তি, এ-ই তার জন্যে যথেষ্ট! অথচ আল্লাহ্‌র কাছে তার অশেষ প্রতিদান তো রয়েছেই!

আল্লাহ তো বলেছেন–

'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছো তারা তো একটি বীজ বপন

করেছো, যা থেকে আসবে সাতটি শীষ। প্রতিটি শীষে থাকবে একশ' দানা। আল্লাহ যদি চান, তাহলে আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন।'

- সূরা বাকারা, আয়াত- ২৬০

এখন বলো, একশ টাকায় পাঁচ-দশ টাকা লাভের ব্যবসা করবে না চল্লিশ হাজার টাকা লাভের ব্যবসা করবে? কোন্ ব্যবসায় পুঁজি খাটাবে বুদ্ধিমান মানুষ!
কিন্তু ভাবলে বড়ো দুঃখ পাই– আজ আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে ভয় পাই।
আল্লাহ বলেন– দানে ধন বাড়ে,
নবীজী বলেন– দানে ধন বাড়ে,
অথচ আমরা কেবল আশঙ্কা করি– দানে ধন কমে যাবে!
কেমন মুসলমান হলাম তাহলে আমরা?
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণায় পূর্ণ বিশ্বাস আনতে কেনো আমাদের মনে এতো দ্বিধা?
হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুমতি দাও!
দাও দান করার জন্যে উদার মন! মুক্ত হাত!

বুদ্ধিমতি স্ত্রীর চোখে ফাঁকি!

নিজ বাসভবনের দরোজা পেরুতে পেরুতে ইকরামা এই ভেবে আল্লাহ্র শোকর করছিলেন যে, যাক রক্ষে, কেউ দেখে ফেলে নি!
কিন্তু সজাগ ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে তিনি লুকোবেন কীভাবে?
অতি অন্তর্পণে তিনি স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, বললেন–
'এতো রাতে এই বেশে কোথায় গিয়েছিলেন শহরের শাসনকর্তা?'
'এই তো জরুরী একটা কাজে'।

'মনে হয় কিছু লুকোচ্ছেন। কিন্তু আমি তো আপনার জীবন-সঙ্গিনী। আমি কি জানতে পারি না– কী উদ্দেশ্যে ছিলো আপনার এই ছদ্মবেশী গোপন অভিযান?'

স্ত্রীকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন ইকরামা। কিন্তু স্ত্রীর চোখে সন্দেহ দেখে এড়িয়ে যাওয়াটা তাঁর কাছে আর ভালো মনে হলো না। তিনি বললেন–

'শুনতেই যদি চাও, তাহলে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলো– কোনোদিন কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না!'

স্ত্রী মৃদু হেসে বললেন–

'আপনার ইচ্ছাকে অবশ্যই আমি সম্মান করবো!'

দানের মহিমা

প্রিয় স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে ইকরামা বললেন–

'তার আগে শোনো, উত্তপ্ত মরুভূমিতে একজন মুসাফিরের জন্যে একটু ছায়ার কতো প্রয়োজন! হোক না তা বাবলা গাছের ছায়া! লাখ দিনারের বিনিময়ে হলেও কি সে তা পেতে চাইবে না?

কিন্তু এরচে' অনেক ভয়াবহ একটি চিত্রের কথা কি আমি তোমাকে বলবো?

ভাবো তো একটু, সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকবে, সেই হাশরের মাঠের উত্তাপ কতো ভয়ংকর হবে! যার একটা দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছর!

কী কঠিন বিপদ হবে মানুষের সেদিন, যখন নিজের ঘামে নিজে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে!

সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না!

প্রিয়তম! সেই কঠিন দিনে আরশের একটুখানি ছায়া-লাভের সওদা

করতে বের হয়েছিলাম আমি আজ!
তুমি তো জানো–
যারা দান করে অতি গোপনে, এমন কি নিজের বাম হাতেরও অগোচরে, তাদেরও ডাকা হবে সেদিন আরশের ছায়াতলে।'
এতোটুকু শুনেই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বুদ্ধিমতী স্ত্রী বলে উঠলেন–
'বুঝেছি প্রিয় স্বামী আমার! আর বলতে হবে না। সত্যি, আপনি বড়ো ভাগ্যবান আর আপনার স্ত্রী হয়ে আমি বড়ো ভাগ্যবতী।'

খলীফার দরবারে খোযায়মা

খলীফা সোলায়মান বিন আবদুল মালিক তখন রামাল্লায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন ভীষণ প্রজাহিতৈষী ও দরদীমনা। খোযায়মা ছিলেন তাঁর এককালের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাই খোযায়মা দেরী না করে মুখোশধারী এবং তার খবর নিয়ে হাজির হলেন বন্ধু সোলায়মানের কাছে। অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়ে খলীফাও তাকে গ্রহণ করলেন সাদরে।

সে যুগের শাসনতন্ত্র তো এ-যুগের গণতন্ত্রের মতো ছিলো না। তাই শাসক সোলাইমান বন্ধু খোযায়মাকে চিনতে দেরী করেন নি এবং খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌঁছতেও খোযায়মাকে কোনো বেগ পেতে হয় নি।

খোযায়মা'র মুখে মুখোশধারীর গল্প শুনে খলীফা খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন–

'যেভাবেই পারো মুখোশধারীর পরিচয় খুঁজে বের করো। উপযুক্ত পুরস্কার তার প্রাপ্য।'

খলীফার সাথে আলোচনা ও সাক্ষাতপর্ব এখানেই শেষ। বিদায় নিয়ে খোযায়মা তাঁর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার তার ফিরে যাওয়ার পালা। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো একটু পরই এক নতুন চমক। যা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না দু'দিন আগের অনাহারে মুমূর্ষ খোযায়মা'র পক্ষে। রওয়ানা হওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে তার হাতে তুলে দেয়া হলো খলীফার একটি 'পরওয়ানা', যাতে লেখা ছিলো–

'আজ হতে তুমি আরব উপ-দ্বীপের নতুন শাসনকর্তা।'

আল্লাহ্ চাইলে সবই হয়

এমনই হয় বন্ধু, এমনই হয়! আল্লাহ কাউকে পুরস্কৃত করতে চাইলে এভাবেই করেন। মানুষের কল্পনাও তাঁর সাহায্যের সীমানা স্পর্শ করতে পারে না। দু'দিন আগেও যে খোযায়মা অনাহারে অনাহারে জর্জরিত ছিলেন আজ সে খোযায়মাই খলীফার দরবার থেকে শাসনকর্তা হয়ে ফিরে এলেন! দান করে করে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পরও এই যে তিনি মানুষের কাছে হাত পাতেন নি, ভরসা করেছেন শুধু আল্লাহ্র উপর, আজ এমন খোযায়মা'র এমন পুরস্কারই তো ন্যায্য পাওনা! সবরের গাছে তো মেওয়া ফলবেই! তাওয়াক্কুলের বাগানে তো ফুল ফুটবেই!

'রাকা'র নিকটবর্তী হতেই জনগণ বেরিয়ে এলো নতুন শাসনকর্তার শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানাতে। জনতার ভিড়ে মিশেছিলেন সাবেক শাসনকর্তা ইকরামা ফাইয়াযও!
আশ্চর্য! তাঁর চেহারায় কোনো ক্ষেদ ছিলো না।
তার মুখের হাসিটিও ছিলো অকৃত্রিম।
কতো মহান মানুষ ছিলেন তাঁরা!

কেনো এমন হয়?

আশ্চর্য!
মানুষ কেনো এমন হয়!
সুদিনে সবাই সবার বন্ধু হয়,
দুর্দিনে কেউ যেনো কারো নয়!
কিন্তু কেনো এমন হয়?
সুখে-দুঃখে সব সময় কেনো মানুষ মানুষের বন্ধু হতে পারে না?

খোয়ায়মা'র কথাই ধরো, সুখের দিনে কতো মানুষের ভিড় ছিলো তার চার পাশে। তার দানে-ধনে কতোজনে কতোভাবে উপকৃত হয়েছে। অথচ মাঝখানের দুঃসময়ে কেউ যেনো তাকে চিনতোই না।

তাই অভিমানী খোয়ায়মা'র বন্ধ দরোজায় কোন দরদী বন্ধু এসে ডাক দিয়ে বলে নি–
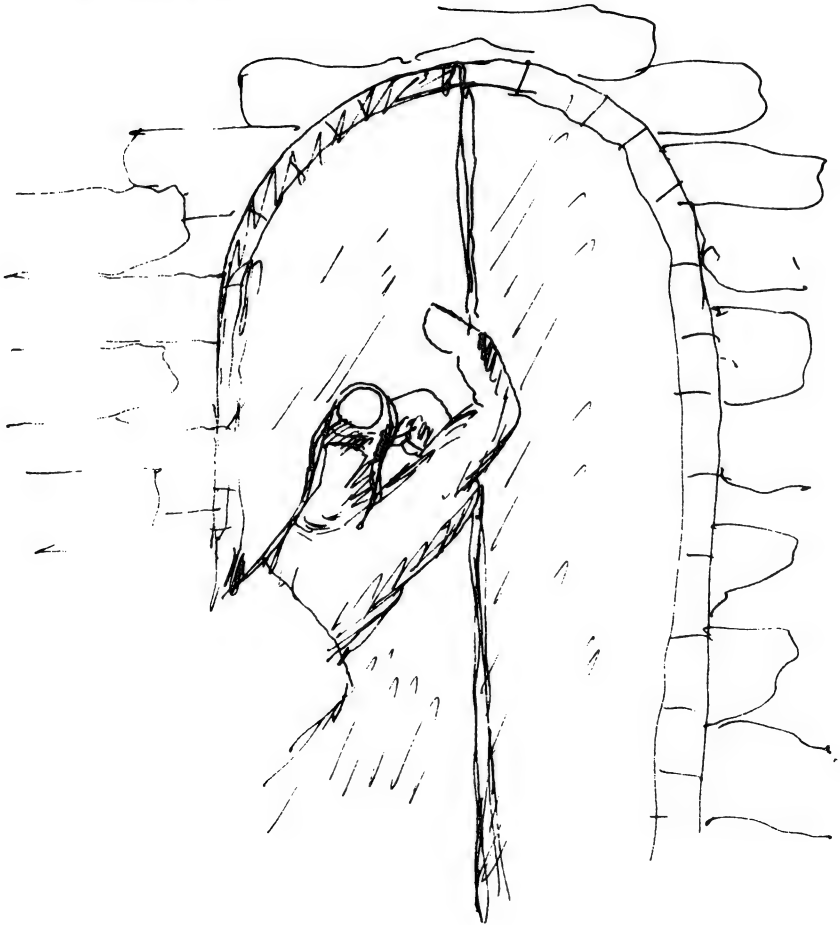
'খোযায়মা! দুয়ার খোলো বন্ধু। আমি এসেছি!'
কিন্তু আজ?
আজ কেনো শাসনকর্তা খোযায়মা'র 'গৃহদ্বারে' মানুষের এই উপচেপড়া ভিড়? তাকে স্বাগত জানাতে কেনো পথে নেমে এসেছে এই অকৃতজ্ঞ মানুষের দল?
এমনি হয় বন্ধু– মুকুটের বন্ধুরা,
এমনি হয় বন্ধু– মানবতার দুশমনরা।
সব যুগে, সব দেশে এই একই ধারা চলেছে, চলছে এবং সম্ভবত চলতেই থাকবে।
অদ্ভুত! বড়ো অদ্ভুত!!

আইনের চোখে সবাই সমান

আমরা তোমাদেরকে যে যুগের কথা বলছি, সে যুগে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে শাসকের ছিলো পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। নতুন শাসনকর্তা সাবেক শাসনকর্তার কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব বুঝে নিতেন এবং কোনো রকম অনিয়ম ধরা পড়লে তড়িৎ বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তেমন ক্ষমতাই তাকে দেয়া হতো।
সেই নিয়মে নতুন শাসক খোযায়মা সাবেক শাসনকর্তা ইকরামার কাছে হিসাব তলব করলেন। হিসাব নিতে গিয়ে খোযায়মা'র মনে হলো– হিসাবে একটা জায়গায় অনিয়ম হয়েছে। এদিকে সাবেক শাসনকর্তা ইকরামা তার সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে ব্যর্থ হলেন।
ফল যা হবার তাই হলো।
ইকরামার ভাগ্য-বিপর্যয় হলো।
জেলের দরোজা পার হয়ে তাঁকে ভিতরে যেতে হলো।

কারাগারে রাত দিন

কারাগারের এক অন্ধ কুঠরীতে ইকরামা এখন বন্দি। ফুলের কোমল পরশে আর স্নিগ্ধ সুবাসে কেটেছে যার জীবন, তিনি এখন শক্ত যবের রুটি খেয়ে আর চটের বিছানায় শুয়ে দিন গুযরান করেন! এক সময় তার মজলিস গমগম করেছে কৃতার্থ মানুষের ভিড়ে, তিনি এখন নির্জন কুঠরীতে আন্দাযে রাত-দিনের পার্থক্য করেন। তবু ইকরামা স্থির প্রশান্ত। নিরুদ্বিগ্ন ও আত্মসমাহিত। ধৈর্য ও প্রশান্তির এমন অপূর্ব সুন্দর মুখচ্ছবি বড়ো একটা দেখা যায় না।
কিন্তু ইকরামার স্ত্রী?

তার মাথায় যেনো বিপদ-মুসীবতের পাহাড় ভেঙে পড়লো। কোনো সম্ভ্রান্ত ও 'শরীফ' (ভদ্র) মানুষ যখন বন্দি হন, তখন তার যতো না কষ্ট, তার শতগুণ কষ্ট ও যন্ত্রণা হয় 'গৃহ-কারাগারে' আবদ্ধ তার পরিবার-পরিজনের। কেননা তারা দু'ধারী তলোয়ারের মতো প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা এবং প্রতিবেশীদের বিদ্রূপ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। অথচ নীরবে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না। সবচে' অসহনীয় হলো– কিছু কিছু মানুষের ভিতরের উল্লাস চেপে রেখে কৃত্রিম সান্ত্বনা দানের নিষ্ঠুরতা। ইকরামার স্ত্রীও তেমনি অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে লাগলেন।

দু'একজন অবশ্য তাকে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেয় নতুন শাসনকর্তা খোযায়মা'র কাছে ধরনা দেয়ার। কেননা তিনি দয়ালু মানুষ। অবলা নারীর অসহায়ত্ব অবশ্যই তাঁর হৃদয়কে নাড়া দেবে।
ইকরামার স্ত্রী এ-সব পরামর্শ শোনেন আর ভাবেন–
তার হাতে তো আরো অব্যর্থ অস্ত্র রয়েছে। একটা 'শব্দের অস্ত্র', যা ব্যবহার করা মাত্র স্বামী তার মুক্তি পেতে পারেন। দুঃখের

অমানিশা দূর হয়ে তাদের জীবনে উদ্ভাসিত হতে পারে সুখের আলো! নয়া আমীরকে তিনি যদি শুধু বলেন–
'মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারকে স্বরণ করো– হে অকৃতজ্ঞ আমীর!'
তাহলেই তো সব মুশকিল আসান হয়ে যেতে পারে!
কিন্তু বলতে যে মানা!
তিনি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!
স্বামী যে বলেছেন–
'আল্লাহ ছাড়া কেউ যেনো না জানে আমার এ-গোপন অভিযানের খবর!'
স্বামীকে দেয়া প্রতিশ্রুতির অমর্যাদা– কী করে করতে পারেন তিনি?
হোক না তা স্বামীর জীবন রক্ষার জন্যেই!
'জান' বড় না 'মান' বড়?

* * *

এভাবে একদিন দু'দিন করে কেটে গেলো ত্রিশটি দিন।
যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ পূর্ণ একটি মাস।
ইকরামার স্ত্রী এরপর আর পারলেন না!
নারীর চিরন্তন মমতা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তার ধৈর্যের বাঁধ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতিজ্ঞা।

মুক্তির 'অব্যর্থ অস্ত্র'

ইকরামার স্ত্রী তলব করলেন তার 'খাস' দাসীকে! তারপর সব কিছু বুঝিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন 'সেই অস্ত্র' দিয়ে শাসনকর্তার মহলে।

বুদ্ধিমতী দাসী একান্ত সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে আমীরের সামনে হাজির হলো এবং তাঁর চোখে চোখ রেখে বললো–

'আমীর! আমার মালিকান বলেছেন, সেই মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারকে স্মরণ করুন!'

আমীর খোযায়মা দাসীর কথায় চমকে উঠলেন! তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ
'কে তিনি? কোথায় তিনি?!'

দাসী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললো–
'আপনার কারাগারে আপনারই আদেশে বন্দি– ইকরামা ফাইয়ায!'
'ইকরামা!!' গোটা জগৎসংসার যেনো খোযায়মা'র সামনে দুলে উঠলো। তাঁর মনে পড়ে গেলো কোষাগারে রক্ষিত চার হাজার দিনার সংক্রান্ত 'অসীয়ত নামা'র কথা, যার উত্তর তিনি পান নি ইকরামার কাছে। এখন সব কিছু যেনো তার সামনে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। সেই মুহূর্তেই তিনি ছুটলেন কারাগারের পথে। উপস্থিত সবাই হতভম্ব অবস্থায় অনুসরণ করলো আমীরকে। ইকরামার সামনে গিয়ে খোযায়মা যখন দাঁড়ালেন, তখন লজ্জায় অনুশোচনায় মাথা তোলা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না।
অবনত মস্তকে তিনি শুধু বলতে পারলেন–
'আমার ভুল ক্ষমা করো বন্ধু!'

ইকরামা কোনো উত্তর করলেন না। তাঁর মুখমণ্ডলে মুক্তির আনন্দোল্লাসও দেখা দিলো না। তার শুধু আফসোস হলো– 'বুদ্ধিমতী স্ত্রী এ কী করলেন!'

মহানুভবতার পুরস্কার

খোযায়মা কালবিলম্ব না করে ইকরামাকে নিয়ে ছুটলেন খলীফার দরবারে। খলীফা খোযায়মা'র হঠাৎ আগমনে বিস্মিত হলেন এই

ভেবে–
'সদ্য নিযুক্ত আমীরের কেনো এই হঠাৎ আগমন? কোনো দুর্ঘটনা নয় তো!'
অনুমতি পেয়ে খোযায়মা খলীফার খিদমতে হাজির হলেন এবং সালাম ও আদব নিবেদনের পর বললেন–
'আমীরুল মুমিনীন! সেই মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারের পরিচয় আমি পেয়েছি! তিনি আমার সাথেই আছেন!'
'কে সেই মহানুভব?!'
'সাবেক শাসনকর্তা– ইকরামা!'
'আচ্ছা!'
খলীফার তলব পেয়ে ইকরামা হাজির হলেন। খলীফা পুলকিত কণ্ঠে বললেন–
'ইকরামা! তোমার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। বলো, কী পুরস্কার চাও?'
'আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনো পুরস্কার চাই না।'
খলীফা দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলেন। বললেন–
'কিন্তু আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই!'
এরপর খলীফা ইকরামাকে আরব উপ-দ্বীপসহ আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। আর বললেন–
'খোযায়মা'র ভাগ্য এখন তোমার হাতে! তাকে বরখাস্তও করতে পারো, আবার সহকারীরূপে বহালও রাখতে পারো!'

* * *

বন্ধু!
কী মনে হয় তোমার?

ইকরামা কি খোযায়মাকে বরখাস্ত করতে পারেন?
অসম্ভব!
অমন বন্ধুকেও কেউ হাতছাড়া করে?
ইকরামা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন এরপর খলীফার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন আর খোজায়মা'র হাত ধরে বললেন–
'খোযায়মা'র চেয়ে ভালো মানুষ কোথায় পাবো আমি এ-যুগে!'
খলীফা সোলায়মান বিন আবদুল মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত ইকরামা ও খোযায়মা স্ব স্ব পদে বহাল ছিলেন।
আর তাদের বন্ধুত্ব?
সে তোমরাই বলো! এমন দু'টি পবিত্র হৃদয়ের মাঝে যে বন্ধুত্বের বন্ধন, তা কি কখনো ছিন্ন হতে পারে!
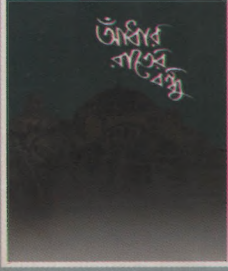
বলতে পারো, অতীতের কোন্ স্মৃতিটা মানুষকে সবচে' বেশি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ডেকেই চলে অবিরত? জানি না, উত্তরে তুমি কী বলবে। তবে আমার মতে- সে হলো দাদী'র গল্পের আসর! আহা! কী মধুময় সেই স্মৃতি!! শৈশবকালে দাদী'র কাছে গল্প শোনার সেই গাল-ফোলানো ও কপাল-কুঁচকানো বায়নার কথা- কে ভুলতে পারে?..

শিশু হয় কিশোর, তারপর পরিণত যুবক। তখনও সে ভুলতে পারে না চাঁদনি রাতের মায়াবী জোৎস্নায় দাদী'র গল্পের আসরের সেই স্মৃতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গল্পের প্রতি তার এই ঝোঁক ও আকর্ষণ। তার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে- সেই হারানো শৈশবে, মাদুরপাতা উঠানে, দাদী'র কাছে, চাঁদনি রাতের সেই গল্পের আসরে!

পাঠক! আমার বড়ো কষ্ট লাগে যখন গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের এই ঝোঁক ও আকর্ষণকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের ব্যর্থতায় দুশমনরা আমাদের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়-গল্প নামের বিষ! আমাদের এই গাফিলতির জন্যে আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?

হ্যাঁ পাঠক! এই দায়বোধ থেকেই আমি প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্যে লিখেছি এই গল্প সিরিজ– ইতিহাসের সত্য কাহিনী অবলম্বনে। ইতিহাসকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রেখে শুধু গল্পের জামাটা পরিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের গায়ে।

-আলী তানতাভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা